শৌভিক বনাম সৌভিক ঃ কার্তিক লাহিড়ীর নিজস্ব ঘরানার সৃষ্টি

বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য

উপন্যাস হয় সাধারণত দু'জাতীয় - সুখপাঠ্য আর সূক্ষ্মপাঠ্য। প্রথম শ্রেণীর উপন্যাসের সংখ্যাই বেশি। এর লেখকরাই জনপ্রিয়। তাঁদের বইয়ের কাটতিও অনেক। সেটা দোষের নয়। সুখপাঠ্য কাহিনী লিখতেও কলমের জোর লাগে, পাঠক আকর্ষণের ক্ষমতা লাগে। সেটাও অনেকের থাকে না। আবার এরই বিপরীতে মুষ্টিমেয় কিছু লেখক থেকে যান যাঁদের কেবল ওপর থেকে জীবনকে দেখবার আগ্রহ নেই, যারা একটু গভীরে ডুব দিতে চান, অতি পরিচিত গতানুগতিক জীবন স্রোতের সমান্তরাল যে অদৃশ্য অথচ বাস্তব প্রবাহটি রয়েছে তার সন্ধানেই এরা আগ্রহী। আধুনিক Narratology -র ভাষায় বলা চলে যে, তাঁরা Paper truth-কে গুরুত্ব দেন। তাঁদের মতে এই অদৃশ্য জীবনপ্রবাহটাই আসল সত্য, পরিচিত দৃশ্য জগৎটা নয়।

কার্তিক লাহিড়ী এই জাতের ঔপন্যাসিক। বাস্তব সত্যের চেয়ে উপন্যাসের সত্যের প্রতিই তাঁর আগ্রহ। কাজটা দুটি কারণে কঠিন। প্রথম, এতে বাস্তবতাকে ভিত্তি করেই তাকে ছাড়িয়ে যেতে হয়। অনেক ক্ষেত্রেই ভারসাম্য বজায় রাখার ব্যাপারে লেখককে সতর্ক থাকতে হয়। দ্বিতীয়, উপন্যাসের তাত্ত্বিকদের একটি অতি পরিচিত সিদ্ধান্ত, After all the Novel tells a story-এতে মার খায়। এদের উপন্যাস গতানুগতিক গল্প বলে না, পরিচিত গল্পকে সামনে রেখে ক্রমশ অপরিচিত জগতের দিকে চলে যায়। বলা উচিত, তা আপাত-অপরিচিত জগৎ, আসলে তা পরিচিত জগতেরই বিপরীত প্রতিফলন। তাই এর বয়ন পদ্ধতি একেবারেই সরল হতে পারে না। ঘন জটিল বুনটের সমাপ্তি পর্যন্ত পৌঁছতে পারলে একটি নিপুন শিল্পকর্মের নিদর্শন পাওয়া যাবে। কিন্তু এর জন্য সতর্ক ও অনুসন্ধানী পাঠকের প্রয়োজন।

কার্তিক লাহিড়ীর প্রায় সব উপন্যাস সম্পর্কেই একথা বলা চলে। তবে এ ব্যাপারে বোধহয় সবচেয়ে এগিয়ে থাকে তাঁর পুরস্কৃত উপন্যাস 'শৌভিক বনাম সৌভিক'। এ রকম বিষয় বোধহয় একমাত্র কার্তিক লাহিড়ীই ভাবতে পারেন। একজন মানুষের নাম, সেই নামের একাধিক অর্থ, তার ভিতর দিয়ে ক্রমশ নানা রহস্যের উন্মোচন — এভাবেই একটি মানুষ ক্রমশ তার নাম এবং সেই নামের একাধিক অর্থ নিয়ে যেন বিভিন্ন সত্তার ক্রমাগত বিভক্তি হয়ে চলেছে। আপাত দৃষ্টিতে যা কেবল শুষ্ক অভিধানের বিষয় তা ক্রমশ একজন রক্ত মাংসের মানুষের জীবন প্রবাহের মধ্যে ঢুকে পড়ে।

আমাদের অনেকের মতোই শৌভিকও কোনোদিন তার নামের মানে নিয়ে মাথা ঘামায় নি। বাবা - মা কেন তার এই নামকরণ করেছিলেন তা জানার কোনো আগ্রহও ছিল না। কিন্তু একদিন গোলমালটা পাকালেন বাংলার শিক্ষক ধ্রুব বাবু বা ধ্রুব স্যার। তাঁর আগ্রহ শব্দার্থতত্ত্বে। সমোচ্চারিত শব্দের বানান ও অর্থ যে আলাদা হয়ে যায় ক্লাসের ছাত্রদের কাছে তা জানানোতেই তাঁর আনন্দ। এই প্রসঙ্গেই শৌভিকের নামের দিকে তাঁর নজর পড়ে। অভিধান জানাচ্ছে যে, শৌভিক এতকাল নিজের নামটিকে যতটা সহজ ও সাধারণ বলে মনে করেছিল এটা আদলেই তা নয়। বাংলায় সে নামের বানান লেখে 'তালব্য শ' দিয়ে, আর ইংরেজিতে লেখে 'এস' দিয়ে। সংস্কৃত অভিধানের নিয়ম অনুযায়ী 'S' থাকলে 'দন্ত্য স' লিখতে হবে। আর তালব্য শ লিখতে গেলে এস্ -এর মাথায় থাকতে হবে অন্তত একটা ফুটকি। ধ্রুব স্যারের জিজ্ঞাসা— তাহলে এস দিয়ে নামের ইংরেজী বানান শুরু করে বাংলায় সে শৌভিক লেখে কীভাবে? তার লেখা উচিত সৌভিক। অথচ, দুটি শব্দের অর্থ আলাদা। প্রায় সব অভিধানের 'শৌভিক' অর্থ 'ঐন্দ্রজালিক' আর 'সৌভিক' মানে হ'ল 'বাজিগর'। তাহলে ছাত্র শৌভিকের নামের আসল মানে কি?

ধ্রুব স্যারের এই প্রশ্নের সামনে তাঁর ছাত্রটিই শুধু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে দাঁড়িয়ে থাকে না, পাঠকেরাও কিছুটা হতভম্ব হয়ে যান। সমস্ত বাংলা উপন্যাস সাহিত্যেই কোনো চরিত্রকে এ জাতীয় সঙ্কটের মুখে দাঁড়াতে হয়েছে বলে জানা নেই। আর এটাই উপন্যাসিক কার্তিক লাহিড়ীর জাত চিনিয়ে দেয়। তার বিষয় আলাদা, বক্তব্য আলাদা এবং আঙ্গিকও আলাদা। গতানুগতিক সুখপাঠ্য রচনা তিনি লেখেন না, লিখতে পারেন না বলে নয়, লেখার আগ্রহ নেই বলে। তাই উপন্যাসের যে বিষয় কল্পনাও করা যায় না, জনপ্রিয়তা হারানোর ঝুঁকি নিয়ে সেটাই তিনি উ পন্যাসের জন্য বাছেন। যেমন এখানে বেছেছেন।

শৌভিকের মতো আমরাও অনেকেই আমাদের নাম সম্পর্কে সচেতন নই। নাম কেবল মাত্র একটা পরিচয় নয়, প্রতিটি নামের আড়ালেই যে একটা রহস্য লুকিয়ে থাকতে পারে, বানান আলাদা হলে যে কেবল নামের মানেই পাল্টে যায় না, ব্যক্তিত্বও যে পাল্টে যেতে পারে, একই মানুষের মধ্যে দুটি পৃথক সত্তার সংঘাত যে অনিবার্য হয়ে উঠতে পারে— চরিত্রের চেনা আবরণটি খুলতে খুলতে কার্তিক লাহিড়ী আমাদের তা জানিয়ে যান। আর চারপাসে জানা জগৎ এইভাবে ক্রমশ আমাদের কাছে অজানা হয়ে ওঠে। এ মানব - চরিত্রের এক ধরণের দার্শনিক অনুসন্ধান। উপন্যাস - রচনাকে এই কারণেই Philosophical Occupation আখ্যা দেওয়া হয় কেবল নিটোল গল্প বলার জন্য নয়। আবার, দর্শন মানে তো কেবল দেখা নয়, তা একাধারে অনুসন্ধানও বিশ্লেষণও বটে। কার্তিক লাহিড়ী এই শেষোক্ত অর্থেই জীবনকে দর্শন করেন। তাঁর নায়ক শৌভিক -ই এই অনুসন্ধানের মাধ্যমে। নিজের অজ্ঞাতসারেই যেন শৌভিককে নিজের দ্বৈত সত্তার মুখোমুখি ক্রমাগত দাঁড়াতে হয়।

ছাত্রজীবন থেকেই তার এই অভিজ্ঞতা ঘটতে থাকে। তরুণ সংঘের বার্ষিক স্পোর্টস -এ তার যাওয়ার কথাই নয়। বন্ধু রাজীব সেখানে 'গো অ্যাজ ইউ লাইফ' - এর প্রতিযোগিতায় নামতে যাচ্ছে মেক-আপ- ম্যান ভোলাদা-র ভরসায়। সে সাজবে ফেরিওয়ালা। হঠাৎই রাজীববের ডাকে সাড়া দিয়ে শৌভিকও একই ইভেন্টে নাম দিয়ে বসে। ভোলা দা তাকে সাজিয়ে দেয় এক ভিখিরি। আর তখনই যেন শৌভিক তার মধ্যে অন্য এক চরিত্রের উপস্থিতি টের পায়। 'শৌভিক এক সম্পন্ন ঘরের মধ্যবিত্ত কৈশোর - যৌবনের সন্ধিস্থলের এক সদস্য থাকে, শরীর মনে হয়ে ওঠে এক পুরো ভিখিরি।' সেই মুহূর্তে সে যেন বদলে যেতে শুরু করে। কেবল সাজার গুণে নয়, হয়তো এই দ্বিতীয় সত্তার সঙ্গে তার একাত্মতার জন্য প্রথম পুরস্কারই সেই জিতে নেয়। জীবনে প্রথম প্রতিযোগিতায় নেমে একেবারে প্রথম পুরস্কার প্রাপ্তি। এখান থেকেই শৌভিকের আত্মজিজ্ঞাসার শুরু।

আসলে পুরস্কারটা পেল কে? শৌভিক না সৌভিক? ঐন্দ্রজালিক না বাজিগর? কে, কাকে চালাচ্ছে? কিন্তু এই পুরস্কার, এর চেয়েও বড় সঙ্কটের মুখে তাকে দাঁড় করিয়ে দেয়। তার বাবা এটাকে কোনো স্পোর্টস বলেই মানতে রাজি নন, তাঁর মতে, 'যেমন খুসি সাজো'— আসলে একজাতীয় ভাঁড়ামি। প্রাচীন কালে রাজসভায় ভাঁড়দের কাজ ছিল সভাসদদের মনোরঞ্জন করা, নানারকম অঙ্গভঙ্গি করে সবাইকে হাসানো। 'যেমন খুশি সাজো' ব্যাপারটাও তো তাই। এর মধ্যে ইন্ডিভিজুয়াল ট্যালেন্টের কোনো প্রকাশ ঘটে না।

অতএব, শৌভিক বাবার উপদেশ মতো কেরিয়ার তৈরি করার জন্য সিওর সাকসেস টিউটরিয়ালে ভর্তি হয়, এখানে বিশেষ করে জয়েন্ট এন্ট্রান্সে সাফল্যের হার বিস্ময়কর। এখানে ভর্তি হয়ে শৌভিক অসাধারণ উন্নতি করতে থাকে, কিন্তু এই র‍্যাট - রেসে সে খুশি হতে পারে না। সে দেখতে পায় তার উন্নতি সহপাঠীদের অভিভাবকদের বিষন্নতার কারণ হয়ে উঠছে। তাছাড়া শৌভিকের যে কেরিয়ার তৈরি করার চেয়ে পছন্দমত বিষয় নিয়ে পড়া - শুনা করার আগ্রহই বেশি— এ কথা অভিভাবকদের বারবার জানিয়েও তার নিষ্কৃতি থাকে না। তার নিজের নামের মতোই সকলের মধ্যে সে দুটি করে অর্থ খুজে পেতে থাকে। প্রত্যেকেরই যেন বাইরে আর ভিতরটা আলাদা। তাই শৌভিকের সমস্যাটা কেবল তার নিজের অভিভাবকরাই নন, বন্ধু - বান্ধব বা তাদের অভিভাবকরাও বুঝতে পারে না, 'ওরা নিজেরা থাকবে সুবোধ বালক গোপালের মত, আর তাকে রাখাল হতে প্ররোচিত করছে।'

কার্তিক লাহিড়ী এখানে আচমকা গোপাল - রাখালের কথা নিয়ে এলেন কেন? এ দুজন তো চিরকাল বাঙালি - চরিত্র। একজন অতি সুবোধ - বালক, যাহা পায় তাহাই খায়,' সকলের কথা শোনে, সমস্ত নিয়ম - শৃঙ্খলা মেনে চলে। চিরকাল একেই বাঙালি ছাত্রের আদর্শ মডেল বলে ধরে নেওয়া হয়েছে। অপর দিকে রাখাল অতি দুরন্ত, অবাধ্যও বটে। সে নিজের পথ নিজে তৈরি করে। তাই তার সংসর্গ সর্বদা পরিত্যজ্য। সে কেরিয়ার - সর্বস্ব বাঙালি জীবনের কাঠামোতে একেবারেই খাপ খায় না। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু একটু মজা করেই বলেছিলেন যে, স্বয়ং গোপাল - রাখালের স্রষ্টার বাল্যকাল কিন্তু অনেকটা রাখালের পথ ধরেই এগিয়েছে। তিনিও কারো কথা শোনার পাত্র ছিলেন না। তাই এ দুটি সর্বক্ষেত্রে পরস্পরের বিরোধী নয়, পরিপুরকও হতে পারে। শৌভিক নিজেকে যতই আলাদা করে ভাবুক কেন, কিছুতেই পুরোপুরি আলাদা হওয়া তার পক্ষে যে সম্ভব নয় তা শৌভিক নয়, স্বয়ং লেখক এভাবেই যেন আমাদের বোঝাতে চান।

শৌভিকের এই সব সমস্যা সমগ্র উপন্যাস জুড়ে। যেখানে লড়াইটা একই মানুষের দুই সত্তার সেখানে গতানুগতিক মীমাংসার কোনো সম্ভাবনাই নেই। শৌভিকের কোনো সমস্যাই মেটে না, যে আত্মিক শান্তি ও আশ্রয়ের অনুসন্ধান তার জীবন জুড়ে, তা তার নিজের আর্তজিজ্ঞাসা হয়েই থাকে। সূচনায় ধ্রুব স্যারের স্কুলের ক্লাসে ছাত্র শৌভিকের নামের একাধিক বানান ও অর্থের তাৎপর্য নিয়ে যে উপন্যাসের যাত্রা, আপাত দৃষ্টিতে যাকে শব্দার্থতত্ত্বের কচকচানি বলে মনে হচ্ছিল তা ক্রমশ আধুনিক পৃথিবীর গভীর থেকে গভীরতর অসুখের সন্ধান দিতে থাকে। কার্তিক লাহিড়ী কেন যে এখানে এক অভিনব আঙ্গিকের সাহায্য নেন তা ধীরে ধীরে পাঠকের কাছে স্পষ্ট হতে থাকে। গোটা উপন্যাসেই কোনো বাক্যের শেষে ছেদ চিহ্ন ব্যবহৃত হয় না। দুশো ঊনচল্লিশ পৃষ্ঠার এই উপন্যাসটি যেন ছেদচিহ্নহীন এক বিশাল বাক্যবন্ধ। শৌভিকের জীবনের তীব্র গতিবেগের সঙ্গে তাল রেখেই যেন কাহিনী তীব্র গতিতে ছুটে চলে। যেহেতু শৌভিকের পথ চলার কোনো শেষ নেই তাই উপন্যাসের সমাপ্তি বাক্যেও কোনো ছেদ চিহ্ন থাকে না। কার্তিক লাহিড়ীকে বুঝতে গেলেও তার এই গঠন - বিন্যাসের তাৎপর্যটুকুও বুঝতে হবে। এই কারণেই প্রথমে বলে নেওয়া হয়েছিল যে, এই লেখক সুখনাট্য রচনায় আগ্রহী নয়। যে ভাঙচুরের মধ্যে দিয়ে আধুনিক জীবন ছুটে চলে তাতে পরিসমাপ্তি কেবল শান্তি কল্যাণের হতে পারে না। এই মুহূর্তে তাঁর 'তবুও স্বপ্ন' নামে একটি উপন্যাসের কথা মনে পড়ছে। সেখানে ইন্টারভিউ পাওয়ার পর এক তরুণকে নিজের ও তার পরিবারের মনে বিপুল প্রত্যাশা জেগে উঠেছিল। কিন্তু ছেলেটি ইন্টারভিউ পর্যন্ত পৌঁছোতেই পারে না, হাওড়া স্টেশনে এক প্রচণ্ড হাঙ্গামায় তার সমস্ত কাগজপত্রই হারিয়ে যায়। সর্বত্রই প্রত্যাশা জাগানো এবং প্রত্যাশা ভঙ্গের যেন একই কাহিনী।

'শৌভিক এবং সৌভিক, ও একই পথ ধরে এগোয়। তার নামের যে বানানের যে অর্থই হোক তার বুরোক্র্যাট বাবা শীতলবাবু তাকে জয়েন্ট এন্ট্রেন্স পরীক্ষায় বসানোর জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। বাবার সঙ্গে বুড়ি পিসি যোগ দিয়ে শৌভিকের ওপর মানসিক চাপ আরও বাড়িয়েই তোলেন। মা শৌভিকের প্রতি সহানুভূতিশীল হলেও অসহায়। প্রেমিকা জবার ভালোবাসার স্বরূপও উপলব্ধি করা তার পক্ষে সম্ভব হয় না। এমন সময় মুশকিল আসানের ভূমিকায় দেখা দেন তার সেই ছোট মামা যিনি শৌভিকের নাম রেখেছিলেন। তিনি দেশবিদেশ ঘুরে বেড়ান, এতকাল তাঁর কোনো নির্দিষ্ট ঠিকানা ছিল না, কিন্তু সম্প্রতি তিনি কলকাতার কাছে এক নির্জন পরিবেশে একটি বাড়ি কিনেছেন। একে একটি বড়ো বাগানবাড়িও বলা যায়। শৌভিককে ওই র‍্যাট -রেসের জগৎ ছেড়ে এখানে চলে আসার আমন্ত্রণ জানান ছোটো মামা। শৌভিকও তাঁর ডাকে সাড়া দেয়। এখানেই যেন শৌভিকের জীবন - বৃত্তের পূর্ণ পরিণতি। এই সচ্ছল নিঃসঙ্গতা তাকে যেন নিজেকেই চিনতে ও জানতে শেখায়, তেমনি এখানে তার সবচেয়ে বড়ো লাভ যতন দা-র সাহচর্য। এই যতন দা-ই শৌভিককে একটি অসাধারণ সত্যের সন্ধান দেয়। ''ভালো লাগা আর ভালো বাসা এক বস্তু নয়। কাউকে ভালো লাগার পর অনেকটা সময় দিতে হয়, অনেকটা অপেক্ষা করতে হয়, তবেই ভালোবাসা জন্মায়।' শৌভিক জবার ক্ষেত্রে এই সত্যটিরই সন্ধান পায় নি। তাই উপন্যাসের শেষে শৌভিকের যতনদা-র আকুল অনুসন্ধান কেবল তার নিজেরই নয়, এই যন্ত্রণাদীর্ণ প্রেমহীন জগতেরও আকুলতা। শৌভিক যতনদাকে পায় না, পাওয়ার কথাও নয়, 'তবুও শৌভিক দাঁড়িয়ে থাকে তারই প্রতীক্ষায় তবু এখন...'। এই প্রতীক্ষার মধ্যে শৌভিকের পাশাপাশি পাঠককেও দাঁড় করিয়ে দিয়ে কার্তিক লাহিড়ী উপন্যাসটিকে যে উচ্চতায় নিয়ে যান তা নিছক কাহিনী - সর্বস্ব আধুনিক উপন্যাস ধারার বিরল ঘটনা।